প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় খুলছে, তারপর?

নির্মল সেন

পাঁচ জুলাই প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় খুলছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার তারিখও ঘোষিত হয়েছে। সংবাদপত্রের খবরে মনে হয়েছে কোথায় যেন একটি কিন্তু আছে। ছাত্রদের পক্ষ থেকে সাংবাদিক সম্মেলন করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কতিপয় সিদ্ধান্তে তারা অসন্তোষ প্রকাশ করেছে। ছাত্রদের পক্ষ থেকে অসন্তোষ প্রকাশ করা হয়েছে ৫৭ ছাত্রের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণকে কেন্দ্র করে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কঠোর সিদ্ধান্তে ছাত্ররা অসন্তুষ্ট হয়েছে। আমার এ মূল্যায়ন নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। বলা হতে পারে এ ধরনের মন্তব্য একপেশে এবং একশ্রেণীর ছাত্রকে আবারও উস্কে দিতে পারে। কারণ অসন্তুষ্ট ছাত্রের সংখ্যা একেবারেই নগণ্য। সকলেই চায় বিশ্ববিদ্যালয় খুলুক। ক্লাস হোক। পরীক্ষা হোক।

আমার প্রশ্ন এখানটায়। দীর্ঘদিন ছাত্র আন্দোলন করেছি। কিন্তু প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে খুব কমই ভাংচুর দেখেছি। আমার ছাত্রজীবনে এ এলাকাটি ছিল ভাল মেধাবী ছাত্রদের পড়াশোনার প্রাণকেন্দ্র। তাই আমার মনেও প্রশ্ন–সেই বিশ্ববিদ্যালয়ে এমন কি ঘটল যে, একসাথে ৫৭ ছাত্রের বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ব্যবস্থা নিল। প্রসঙ্গত আমার মনে পড়ছে গত বছরের স্থাপত্য বিভাগের একটি আন্দোলন এবং ভাইস চ্যান্সেলর নিয়োগ এবং প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ নিয়ে শিক্ষকদের ক্লাস বর্জন। আমার জানামতে দেশের কোন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকরা এ ধরনের দীর্ঘদিন ক্লাস বর্জন করেন নি। আমার ধারণা প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশে সেই থেকেই চিড় ধরেছে।

তাহলে এবারের ছাত্র অসন্তোষ এবং ভাংচুরের কারণ কি? আমার কাছে এ ঘটনার প্রাথমিক কারণটি একান্তই হাস্যকর। বিশ্ববিদ্যালয় একটু কঠিন হলে এ পরিস্থিতির সৃষ্টি হতো না। শুনেছি ছাত্ররা নাকি দাবি করেছিল বিশ্বকাপ ক্রিকেটের সময় বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ রাখতে হবে। ছাত্রদের দাবিতে বিশ্বকাপ ফুটবলের সময়ও নাকি বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ রাখা হয়েছিল। এ সিদ্ধান্ত সঠিক ছিল না, তা বলাই বাহুল্য। শুনেছি এবার এ দাবি তেমন জোরদার ছিল না। এ দাবি মুখ্যত ছিল নতুন ছাত্রদের। পুরনো ছাত্ররা পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিল। এমনকি এ দাবি প্রতিরোধ করে যথাসময়ে পরীক্ষা দেয়ার মানসিকতাও তাদের ছিল। কিন্তু সব কিছু জট পাকিয়ে যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের আর একটি সিদ্ধান্তে।

মার্চ মাসে একটি ঘটনা ঘটে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে। সলিমুল্লাহ দীপু নামে পুরকৌশল বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের এক ছাত্র ক্লাস টেস্টে তার এক অনুপস্থিত সহপাঠীর হয়ে পরীক্ষা দেয়। অথচ এ পরীক্ষার কোন গুরুত্ব ছিল না কারণ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা পদ্ধতি অনুযায়ী ক্লাসে উপস্থিত হবার জন্য শতকরা দশ, ক্লাস টেস্টের জন্য শতকরা বিশ এবং টার্ম ফাইনালের জন্য শতকরা সত্তর নম্বর বরাদ্দ থাকে। দীপুর ভাষ্য অনুযায়ী কৌতুক (ফান) করার জন্য সে এ কাজ করেছিল এবং ধরা পড়েছিল। অথচ তার সহপাঠীও তাকে এ ব্যাপারে অনুরোধ করে যায়নি। কেউই ভাবেনি যে, এই বিশ নম্বরের ক্লাস টেস্টের জন্য তার কোন গুরুদণ্ড হবে। বা এমন কোন ঘটনাও বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনদিন ঘটেনি। কিন্তু এবার তাই ঘটল। ২১ এপ্রিল জানা গেল, দীপুকে এক বছরের জন্য বহিষ্কার করা হয়েছে। ফলে পরিস্থিতি ভিন্ন রূপ নিল। দীপুর প্রশ্নটি আবেগের জন্ম দিল। বিশ্বকাপ ক্রিকেটের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ রাখতে হবে-এ কথা নতুন জোর পেল। কিন্তু কোন ছাত্র প্রতিষ্ঠান এ ব্যাপারে এগিয়ে এলো না। তাদের বক্তব্য হচ্ছে, এ ব্যাপারে প্রশাসনই সিদ্ধান্ত নেবে। তবে তাদের দুঃখজনক অভিজ্ঞতা হচ্ছে, সব সময়ই যেন বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি মহল চেয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ে গোলমাল হোক। ক্লাস বন্ধ হোক। এতে ছাত্রদের ক্ষতি হলেও যাঁরা Consultancy'র সাথে জড়িত তাঁদের হয় বাড়তি সুবিধা। তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপকরণ এবং পরিবহন ব্যবহার করে বাইরে সকল কর্মকাণ্ড চালিয়ে যেতে পারেন। ছাত্রদের এ অভিজ্ঞতা একান্ত তাদের হলেও প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নে আমার খটকা লাগে। অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্দোলনকালে শিক্ষকরা প্রতিপক্ষ হন না– ছাত্রদের সাহায্য-সহযোগিতায় এগিয়ে আসেন। অথচ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে দেখছি ভিন্নরূপ এবং এমন দৃশ্যের অবতারণা হলো ২৫ এপ্রিল দুপুরে ভাইস চ্যান্সেলরের সাথে ছাত্রদের আলোচনাকালে। ছাত্রকল্যাণ পরিচালক এ বৈঠক ত্যাগ করায় আলোচনা ভেঙ্গে যায়। রাতে ভাংচুর হয় বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা।

তবে এ পরিস্থিতিতেও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত তারিখে পরীক্ষা হবে বলে ঘোষণা দেয় এবং বেশ কিছুসংখ্যক ছাত্র জানায়, তারা পরীক্ষা দিতে প্রস্তুত। কিন্তু তাদের এই সাহসী সিদ্ধান্ত বানচাল হয় ২৬ এপ্রিল রাতে সাধারণ ছাত্রদের সভার সময় পুলিশের হস্তক্ষেপে। বিনা ওয়ারেন্টে হঠাৎ পুলিশ ক্যাম্পাস থেকে তিন ছাত্রকে গ্রেফতার করে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে। শেষ পর্যন্ত পুলিশ মাফ চেয়ে ছাত্রদের ছেড়ে দেয়।

এর পর পুলিশ কেন এলো, কার নির্দেশে এল, কেন ছাত্রদের গ্রেফতার করল, কেনইবা কর্তৃপক্ষ নীরব থাকল– এ ধরনের নানা প্রশ্নে উত্তেজিত ছাত্ররা শিক্ষকদের এলাকায় যে ধরনের ভাংচুর করেছে তা সভ্যজগতে কোন ছাত্রনামধারী তরুণের কাছ থেকে প্রত্যাশিত নয়। তবে ঐ সময় শিক্ষকদের ঢাকেশ্বরী এলাকার বাসভবন থেকে এক রাউন্ড গুলিবর্ষণ এবং এক ছাত্রকে আটক করে প্রহার করাও প্রত্যাশিত ছিল না। আর এই ভাংচুরের পটভূমিতে ২৭ এপ্রিল প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দেয়া হয়। প্রশ্ন উঠল– এজন্য দায়ী কে? একশ্রেণীর ছাত্র, না বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের ব্যর্থতা।

সেই প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় খুলছে ৫ জুলাই। এর মাঝখানের ঘটনা হচ্ছে ২৫, ২৬ এপ্রিলের ঘটনার জন্য ৫৭ ছাত্রের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ। এ ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে ৬ সদস্যবিশিষ্ট তদন্ত কমিটির সুপারিশে। তদন্ত কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী একজন স্থায়ীভাবে বহিষ্কৃত। তিন জনকে এক বছরের স্থগিত দণ্ডাদেশসহ দুই বছরের বহিষ্কারাদেশ, ২২ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে দণ্ড ও ৩১ জনকে জরিমানাসহ বিভিন্ন ধরনের শাস্তি।

আমার মতো বাইরের মানুষের পক্ষে এ তদন্ত কমিটির রিপোর্ট চ্যালেঞ্জ করার কথা নয়– তবে আমি যতদূর জানি, যাদের বিরুদ্ধে ভাংচুরের অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে– তাদের একজন সেদিন ক্যাম্পাসে ছিল না। একজন জন্ডিসে আক্রান্ত ছিল। অপরজন ভাংচুর প্রতিরোধ করার চেষ্টা করছিল এবং এ ছাড়া অসংখ্য অভিযুক্তকে আদৌ জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়নি। এর পরেও তদন্ত কমিটিতে নির্ভয়ে সাক্ষ্য দানের পরিবেশ ছিল না। তবে এর চেয়ে বড় কথা হলো, আমার মনে হচ্ছে, তদন্ত কমিটির এ রিপোর্ট শিক্ষক-ছাত্রদের সম্পর্ক তিক্ত করবে। কারণ শুনেছি ছাত্রঐক্যের চার দফা আর শিক্ষক সমিতির সাত দফার প্রেক্ষাপটেই এ তদন্ত কমিটি গঠিত হয়। অথচ সুপারিশে একটি পক্ষকেই সব কিছুর জন্য দায়ী করা হয়েছে এবং এ পরিস্থিতিতে হয়ত দাবি উঠেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল ঘটনারই বিচার বিভাগীয় তদন্ত করা হোক–নিরপেক্ষ তদন্ত চাই।

এছাড়া এও পরিষ্কার, নয় যে, ২৬ এপ্রিল বিশ্ববিদ্যালয়ে কার নির্দেশে বা অনুরোধে পুলিশ এসেছিল। আবার শিক্ষকদের এলাকায় ভাংচুরের আগে কেন পুলিশ প্রত্যাহার করা হয়েছিল। তাহলে এর পিছনে কি কোন মহলের হাত ছিল? বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থায়ী শান্তি ফিরিয়ে আনতে হলে এ প্রশ্নের জবাব প্রয়োজন।

আমার এই লেখা পড়ে নিশ্চয়ই কোন কোন অভিভাবক আমাকে গালি দেবেন। শাপ-শাপান্ত করবেন। বলবেন কানা গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভাল। আপনাদের ছেলেদের ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে ওদের ঝেঁটিয়ে বিদায় করা হোক।

আমি আপনাদের জন্য আমার জীবনের একটি ঘটনা বলব। পাকিস্তান আমল। ছাত্র ইউনিয়নের এক সদস্যকে রাজনীতি করার অভিযোগে জগন্নাথ কলেজ থেকে বহিষ্কার করা হলো। আমরা অনুনয়-বিনয় করলাম। কাজ হলো না। অধ্যক্ষ রেগে তার সার্টিফিকেটে লিখে দিলেন– BAD CHARACTER.

আমরা হতভম্ব। চলে গেলাম কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজে। অধ্যক্ষ আখতার হামিদ খান। প্রাক্তন আইসিএস। তিনি সার্টিফিকেট দেখে হাসলেন। বললেন, নির্মল, ছাত্র বয়স Formative Age. এ সময় কেউ স্থায়ীভাবে খারাপ হয় না। খারাপ হতে পারে Teacher– কারণ তারা Matured। ওকে বলো আমার কলেজে ভর্তি হতে। আমাদের সেই ছাত্রবন্ধু এখন ঢাকা হাই কোর্টের সম্মানিত বিচারপতি।

তাই আমার কথা হচ্ছে অপরাধ করলে দণ্ড পেতে হবে; তবে সে দণ্ড যেন একপেশে না হয়– সে দণ্ড যেন এক তরুণের সংশোধিত হবার পথ অবরুদ্ধ না করে। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, একমাত্র পূর্ব পাকিস্তানের গবর্নর মোনেম খানের আমলে এ ধরনের ডজন ডজন ছাত্রের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হয়েছিল সমাবর্তন অনুষ্ঠানে তাকে অংশগ্রহণ করতে না দেয়ায়।

আর দণ্ডদাতাদের বলব, সত্যি সত্যি স্থাপত্য বিভাগের আন্দোলন, শিক্ষকদের ৪১দিন ক্লাস বর্জন এবং খেলার মতো একটি ছোট্ট ঘটনা নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থতা সার্বিকভাবে কর্তৃপক্ষের সুনাম বহন করে না। এ ধরনের ঘটনা একের পর এক ঘটতে থাকলে বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবি আদৌ অযৌক্তিক মনে হবে কি!

তারিখ ... JUL 3 1999
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২